❋ রজত জয়ন্তী ❋

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা

ক্লিভল্যানড

১৯৭২ ~ ১৯৯৭

❋ Silver Jubilee ❋

Bengali Cultural Society

Cleveland

1972 ~ 1997

Those Were the Days ... ...

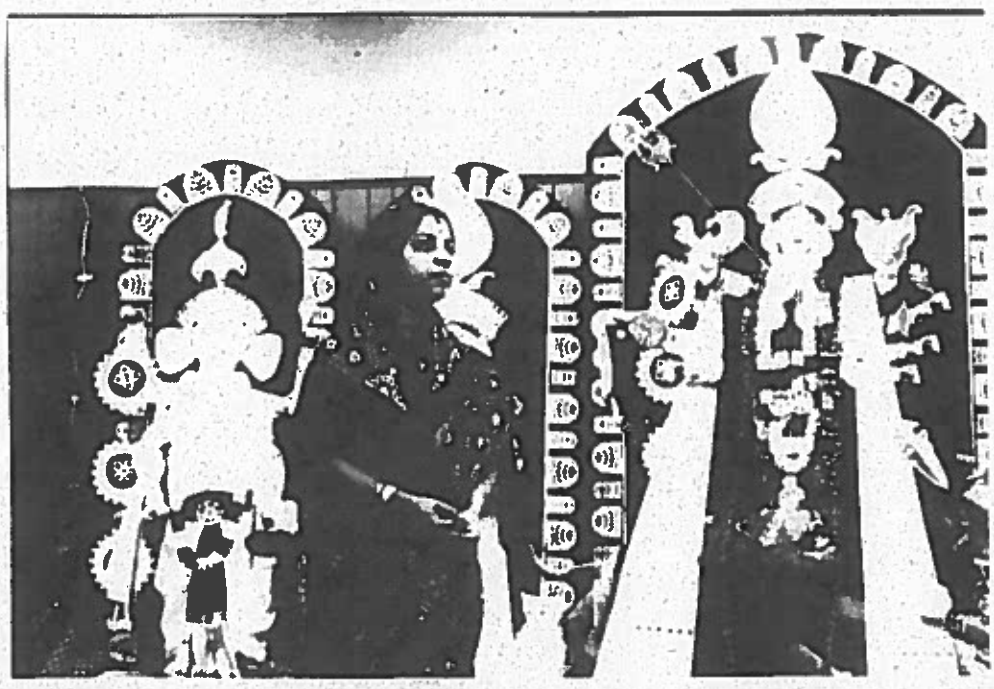

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং, শীতকালে তু শর্বরী
পরোপতাপিনঃ সর্বে প্রায়শঃ দীর্ঘজীবিনঃ

(গ্রীষ্মকালে দিন এবং শীতকালে রাত্রি দীর্ঘ; অপরকে যারা ক্লেশ দেয় তারা প্রায়ই দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে।)

কি ভাগ্য, দেবভাষার এই আপ্তবাক্যটিতে ব্যতিক্রমেরও জন্য একটু জায়গা রাখা আছে। আর ব্যতিক্রম তো আছেই, নইলে জন্মের পর দু দশক পেরিয়েও আজও কি'করে নিজেকে শাখা প্রশাখায় প্রসারিত করে চলেছে, ফুলের পর ফুল ধরাচ্ছে ক্লীভল্যানডের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা?

এক শতকের চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু কম সময় নয়। কালের এই দীর্ঘ বিস্তারে নিয়মের শাসন ভেঙে স্বভাবতই মন উদ্বেল হয়ে ওঠে অতীতের টানে, নিজের অস্তিত্বের পরিধি ছাড়িয়ে চেয়ে দেখতে চায় ওপারের জগৎকে, মোনোই বা এক লহমারই জন্য। কৌতূহলী হয়ে ওঠে প্রাণ, জানতে চায় সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী কিভাবে পালন করবে পরবর্তী প্রজন্ম, কিভাবে উদ্‌যাপিত হবে তার প্রথম শতবার্ষিকী!

আমাদের সকলেরই বাসনা, আজকের এই শুভানুষ্ঠানের বারংবার পুনরাবৃত্তি। দীর্ঘজীবি হোক ক্লীভল্যানডের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা!

From the Editors' Desk

Verily as do days in summer and nights in winter, he that inflicts pain on others often dies hard. Happily, though, the adage, pronounced originally in Sanskrit, leaves room for exceptions. And, indeed there are exceptions, or else how could Cleveland's Bengali Cultural Society flourish and flower even after two decades of its birth?

A quarter of a century is a long time. It tends to pamper wistful yearnings for the past as well as desire for a glimpse of the region spreading beyond one's own frontiers. One wonders how the next generations will celebrate the society's fiftieth anniversary, its first centennial!

We wish the society many happy returns of this occasion. Long live BCS!

শ্লীভল্যানড বঙ্গসংস্কৃতি সংস্থার তিন অধ্যায়

রণজিৎ দত্ত।

শ্লীভল্যানড বঙ্গসংস্কৃতি সংস্থার রজৎ জয়ন্তী উৎসবের উদ্‌বোধনী-ভাষণ দেবার আমন্ত্রন আমাকে অভিভূত করেছে।' স্বভাবতই আমি এজন্য গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এ সম্বন্ধে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয় যে এ সম্মান আমার ব্যক্তিগত নয়, নিজস্ব অর্জিত তো নয়ই। এ সম্মান সমষ্টিগত। পঁচিশ বছর আগে আজকের তুলনায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালীর উৎসাহে ও উদ্দীপনায় এ সংস্থার সূচনা। এই স্বল্প সংখ্যক বাঙালী (এবং কিছু আমেরিকান সমর্থক) শুধু শ্লীভল্যানডেরই বাসিন্দা ছিলেননা, সমস্ত ওহায়ো থেকেই এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এই সংস্থার সংগঠনের আদিপর্বে। কোন পরিবেশ ও প্রেরণা এই সংগঠনের উৎস, সে আলোচনা পরে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আজকে আমাদের এই রজত জয়ন্তী উৎসব সেই প্রেরণা ও চিন্তাধারাকেই সম্মান জানাচ্ছে। সেই চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক বিপ্লবের সূচনা করেছে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাভাষাভাষী হিসাবে আমাদের বিশেষ স্থান করে দিয়েছে।

অভিজ্ঞতা বলে যে এই ধরণের সংগঠনের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যেই আদি উৎসাহ উদ্দীপনায় জড়তা আসে। জড়তার সূত্র ধরে আসে অকর্মণ্যতা ও অবসন্নতা। এবং এর পরিণতি সংস্থার অবলুপ্তিতে। স্বভাবতই যাঁরা গত পঁচিশ বছর ধরে উৎসাহ নিয়ে এই সংস্থা লালন করেছেন, এর ক্রিয়াকর্মের গতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, তাঁরাও আজ এ সম্মানের অংশীদার। বস্তুত গত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের এই সংস্থা সতেজ ও প্রাণবন্ত আছে বলেই আজ এ রজতজয়ন্তী সম্ভব। আমি সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যে কোনও প্রাণবন্ত সংস্থার তিনটি অধ্যায় থাকে, আদি, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ। অতীতের প্রেরণা ও আদর্শকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় বর্তমান, ও বর্তমানই সূচনা করে সাফল্য ও প্রত্যাশাময় ভবিষ্যতের। আমি এ সংস্থার তিনটি পর্ব নিয়ে স্মৃতিচারণা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি, যে এই উদ্বোধনী ভাষণের আমন্ত্রনলাভের সম্মান সমষ্টিগত। কিন্তু, এই লিখিত প্রবন্ধানুগত মতামতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। অতীতের মহিমা পরিকীর্তন বা বর্তমানের স্তুতি বা নিন্দা অথবা অনুরূপ কোনও প্রজল্প এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য যদি শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে, যদি কোনও বিশ্লেষণ-অনুধাবনের সঞ্চার করে, তবেই আমি সার্থক। এটাই আমার শিরোপা।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ছোট একটা ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল। আমরা তখন প্রায় সকলেই ভারত বা পাকিস্তানের অধিবাসী। তখনকার ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে দুরত্ব ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী। সুদূরের সেই ক্ষীণ ঘূর্ণি কলকাতায় ভেসে এসেছিল মন্দাক্রিন হয়ে, সেখানকার মন্দাক্রান্তা জীবনলয়ে কোনও ছন্দপতন না ঘটিয়ে।

তারপর প্রায় বছর কুড়ি পর বসন্তের সেই ক্ষীণ ঘূর্ণি আমাদের অজান্তে তীব্রতর কালবৈশাখীর রূপ নিয়ে পূর্ণ রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হল। পদ্মা যমুনার জল ফুলে ফেঁপিয়ে 'গর্জে উঠল দারুণ রোষে'। সেই ঝড় শুধু বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই আছড়ে পড়লনা, তার গভীর গর্জন ছড়িয়ে গেল সমস্ত পৃথিবীতে - কলকাতা, করাচি, দিল্লী, ডাবলিন, লনডন, প্যারিসে। ঝড়ের সেই ডমরুনিনাদ বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে,

আরব্য, পারস্য, ও ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়ে অতলান্তিকের দুই উপকূলেও কল্লোল তুলেছিল। আজকের পরিপ্রেক্ষিতের মতো বাঙালীরা সেদিন সমস্ত মহাদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও দেশে বিদেশে পৃথিবীর সমস্ত বাংলাভাষাভাষী সেদিন আত্মবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নবচেতনায় উদবুদ্ধ হল। উত্তর আমেরিকার নগরে শহরে যেখানেই কয়েকঘর বাঙালীর বাস, সেখানেই গড়ে উঠল পূর্বপাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন ও সাহায্য সমিতি।

সেই উদ্বেল উদ্দীপনা থেকেই ১৯৭০এর প্রথমাংশে জন্ম নিল উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে -- নিউ ইয়র্ক, বসটন, শিকাগোতে বিভিন্ন বঙ্গসংস্কৃতি সংস্থা। গত দু-এক বছর ধরে অনেক সংস্থাই তাদের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করছে, আমাদের ক্লীভল্যানডও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রথমে সংস্থাগুলো প্রায় সমস্তই তাদের সংবিধানানুযায়ী ছিল অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল: আত্মবোধ ও আত্মসচেতনতাকে দৃঢ়মূল করা এবং উত্তরসূরি বা নবপ্রজন্মদের মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয় ও ধারাবাহিকতা প্রব্যাপ্ত করা। ইতিমধ্যে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্ব সত্তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বভাবতই সংস্থাগুলোর ভিত্তিমূলে ছিল প্রচুর নবলব্ধ শ্লাঘা। গোড়ায় সমস্ত উৎসবই অনুষ্ঠিত হত এপার ওপার দুটি বাংলার সমবেত ও যৌথ প্রচেষ্টার সমন্বয়ে। এর পর সংখ্যায় দুই বাংলার ক্রমবর্ধমান অভিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী সংবিধানের আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হল ও কর্মসূচিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হল। ক্রমে সংস্থাগুলো পৃথক হল এবং দুই বাংলার যৌথ ও সমবেত অনুষ্ঠান বিরল হল। এটাই আমাদের সংস্থার আদিপর্ব।

এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য হয়তো অবান্তর হবেনা। বঙ্গসংস্কৃতি সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠার পর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ভারত-উপমহাদেশের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে অনেক পৃথক সংস্থার উদ্ভব হল। উদাহরণ: ভারতী সংস্কৃতি, গুজরাট সমাজ, মারাঠী মণ্ডল ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে এদের পিছনে কোনও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা ছিলনা এবং জাতিসংঘের কাছ থেকে মাতৃভাষার জন্য কোনও স্বীকৃতি নেবার দাবী ও প্রচেষ্টা ছিলনা।

আজ যখন এদেশের বঙ্গসংস্কৃতি সংস্থাগুলোর (ক্লীভল্যানডও এর অন্তর্ভুক্ত) কর্মসূচি অনুধাবন বা অনুবিশ্লেষণ করি, তখন নতুন ভাবনা, চিন্তাধারা, বা অভিনবত্বের অভাব স্বভাবতই দৃষ্টিতে আসে ও মনোবেদনার কারণ হয়। সংস্থাগুলোর বাৎসরিক কর্মসূচি আরম্ভ হয় ইংরাজি বছরের শুরুতে, দেশীয় প্রথায় বসন্তের শুক্লপক্ষে সরস্বতী পূজো দিয়ে। তারপরই আসে বংলা নববর্ষ, ২৫শে বৈশাখ ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর বাধ্যতামূলক বা অবশ্য-অনুষ্ঠিতব্য উৎসব। গ্রীষ্মে আসে বনভোজন -- যা অনুষ্ঠিত হয় শহরতলীর কোনও প্রমোদোদ্যানে। তারপর মাসাধিক বিরতির পর আসে শারদোৎসব ও বিজয়া সম্মেলন। বাৎসরিক কর্মসূচির যবনিকাপাত হয় আমেরিকার গৃহদেবতা সন্ত নিকোলাসের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আনন্দবিতরণের দ্বারা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে এই উৎসবগুলোতে নৃত্যগীত ও ভোজনেরই বাহুল্য থাকে। ভোজ্যতালিকা নির্ধারিত হয় বয়সবিভেদ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বাঙালী পদ, নবীনদের জন্য অবশ্যই পিজ্জা ও হট ডগ, এবং এ প্রথাও প্রায় বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠানগুলোয় কোনও চিন্তাগর্ভ আলোচনাসভা একান্তই বিরল।

স্বভাবতই একটা প্রশ্নের উদয় হয়: ভবিষ্যতের জন্য অভিনবত্ব বা নতুন প্রেরণা ও চিন্তাধারার উৎস কোথায়? যে প্রেরণা বঙ্গসংস্থাগুলোর ভিত্তিমূল, অর্থাৎ মাতৃভাষা ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার, সেই প্রেরণা আজ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে

পড়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে ভাষা দিবস আজ শুধু ঢাকা-কলকাতায়ই নয়, এটা উদ্‌যাপিত হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর মহানগরগুলোতে।

আর এ-জাতীয় উৎসব শুধু বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে দেশেই প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেই আজ মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। যথা যুক্তরাজ্যে কার্ডিফে (ওয়েলশ্‌ এবং ইংরিজি ভাষা), আয়ারল্যানডের ডাবলিনে (গ্যালিক এবং ইংরিজি ভাষা), বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌সে (ফ্লেমিশ ও ফরাসি ভাষা), স্পেনের মাদ্রিদে (বাস্‌ক্‌ এবং স্পেনীয় ভাষা) ইত্যাদি। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার ইতিহাস বাঙালীর ইতিহাস। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বাঙালীর মস্ত অবদান।

আমরা কেন এপার-ওপার বাংলার অভিবাসীরা যুগ্মভাবে ফ্রীডম্যানডে ভাষা দিবস উদ্‌যাপন করিনা? শুধু বাংলায় বই নয়, বাংলা সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি নিয়ে কেন আলোচনা করিনা?

আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকে বিদেশী বা পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী। তাদেরকে উৎসাহিত করে বাংলা ও পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যে সমন্বয় আনা কি সম্ভব নয়?

এপার-ওপার বাংলা মিলিয়ে সামাজিক মিলনোৎসব -- বিজয়া সম্মেলন, ইদের মিলাত, বা বাৎসরিক বনভোজন কেন উদ্‌যাপিত হয়না?

উপমহাদেশের কোনও অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা কি সম্ভব? যাদেরকে আমরা নিয়মিতভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সামগ্রী (বই, ওষুধ ইত্যাদি) ভিত্তিক সাহায্য করতে পারি। আজকাল পশ্চিমবঙ্গ অনেক বেসরকারী (Non-Government Organization) স্বাস্থ্য, শরীর ও শিশু হিতকর এবং গঠনমূলক সংস্থা বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রশংসনীয় সমাজসেবায় লিপ্ত। যে কোনও রকম আর্থিক সাহায্য তাদের সহায়তা ও প্রেরণা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উপসংহারে দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনার উল্লেখ করি যা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের কারণ।

কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মিলিত আঞ্চলিক সংস্থার (SAARC) বাৎসরিক সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরিজি তর্জমা আবৃত্তি করেছিলেন:

বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল --
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ --
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।।

তারপর, এবছর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম শেখ হাসিনা চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগনের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে। এবার তর্জমা নয়, সম্পূর্ণ বাংলাভাষায়:

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় .....

অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকার দূরদর্শনে শেখ হাসিনার বাংলা আবৃত্তিতে বিস্মিত হয়েছি নিশ্চয়ই, গর্বিত হয়েছি ততোধিক। মনে হয়েছে যে সত্তরের দশকের কালবৈশাখীর দিনগুলো আজ কত পেছনে। চারিদিকে শান্তি ও নিস্তব্ধতা। এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ:

ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর।।

সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ...

Toward the Fiftieth Birthday of Cleveland's BCS

A. Rupa Datta

Many of my fondest memories and proudest moments surround Bengali Cultural Society events: summertime picnics, visits from the pantheon of Bengali cultural and political figures, our own artistic endeavors. I am delighted and honored to be congratulating Cleveland's BCS on its twenty-fifth birthday. Just as my friends and family celebrated my twenty-fifth birthday by setting hopes for my future, so too we should set high goals for BCS's second twenty-five years, encouraged by its first quarter century of success. It is only natural that our assessments of and aspirations for BCS respond to the changes we have seen while the organization has come of age - changes in the local Bengali community and in the American society which has been our home.

Twenty-five years ago, we drove several miles to a neighborhood Korean grocer - as he was our only source of ginger and hot peppers; Asian Indians and Native Americans were commonly confused in mainstream parlance; a typical living room was sufficient to contain the entire membership of the BCS. As I began school, my teachers called me 'Rupa' rather than tackle my more challenging first name, 'Atreyee.'

At such a time, BCS activities focused inward on providing cultural sustenance and education to members far from home and to a nascent second generation. Externally, in the face of widespread ignorance about India, BCS pioneers sold many a *shingara* at 'Festivals of Nations' downtown, and visited many an elementary school with lecture-demonstrations introducing children to topics Indian. Whether by grand design or instinctive response to needs, BCS in its early years served its membership both as social support and as advocate to the surrounding world.

Today, Asian Indians have our own U.S. Census ethnicity category, coriander is available in every urban grocery store, and a South Asian man runs a 7-11 convenience store on the hit television show 'The Simpsons'. Although no one calls me 'Atreyee' even today, American teachers more often embrace unfamiliar names than shun them. In order that BCS continue to be meaningful and productive, a renewed mandate is appropriate.

The first twenty-five years of BCS have been strong on the cultural; the next twenty-five might focus on the society. Whereas companionship and children's library books may have nourished the membership in its early years, today's Bengalis constitute a full-fledged community; some aspects of our status will be new: third generation Bengali-Americans, the first Bengali retirees. Others will simply be more prevalent: illness and disability, economic difficulties, domestic abuse. BCS members have quietly supported one another through many such experiences already, the community will thrive or falter as it confronts these issues openly and with compassion.

ষাটের দশক ও ক্লীভল্যানডের বাঙালী সমাজ

রণজিৎ দত্ত

আমি আমেরিকায় আসি ১৯৫৮ সালে, পেনসিলভেনিয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (Pennsylvania State University) পড়াশুনার শেষ পর্ব সারতে। সেখান থেকে সরাসরি চাকরি নিয়ে ক্লীভল্যানডে এসে পৌঁছাই ১৯৬১তে।

ক্লীভল্যানডে সে সময়ে বাঙালীর তো কথাই নেই, ভারতীয়দেরই সংখ্যা ছিল একান্ত নগণ্য। অনেক আগে অবশ্য কিছু বাঙালী মুসলমান এসে বসবাস শুরু করেছিলেন এখানে, তাঁদের সন্তান সন্ততিরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কেউ কেউ সঙ্গীত ইত্যাদিতে নামও করেছেন। কিন্তু আমি যখন আসি, বাঙালি বলতে তখন শুধু ছিলেন সপরিবার বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আর রণন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত সান্যা, তিনিও আমার আগেই এ শহরে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে এ-শহরের পুরোন বাঙালীদের অন্যতম সুকুমার রায়, কিন্তু তাঁরও ক্লীভল্যানডে আগমন এর পরে।

ষাটের দশক আর আজকের ক্লীভল্যানডের মধ্যে বিস্তর ফারাক, বলাই বাহুল্য। বাঙালী সমাজে পূজানুষ্ঠান বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানের বালাই ছিলনা। যতদূর মনে পড়ে, প্রথম সরস্বতী পূজো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ বা ১৯৬৫তে, রণন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। বলতে গেলে সেটাই ছিল ক্লীভল্যানড-প্রবাসী বাঙালীদের প্রথম মিলনোৎসব।

প্রথম দিকে সরস্বতী পূজোর অনুষ্ঠানে Light of Yoga Society নামে একটি দলের মার্কিনী সদস্যরাও উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু ওদের পদ্মাসনে বসে ধ্যান ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের পূজানুষ্ঠানের আবহাওয়ার মিল না থাকায়, আমাদের হৈ হুল্লোর ওদের পছন্দ না হওয়ায়, বছর খানেক পর থেকে ওরা আসা বন্ধ করে দেয়, আর আমরাও ওদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করিনি।

বাঙালীদের বেশীর ভাগই থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে কিংবা East Cleveland অথবা Cleveland Heightsএ। মোটামুটি সকলেই এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। প্রশান্ত সান্যা ও বাণীপ্রসাদ, এঁরাও এসেছিলেন পড়াশুনা করতেই। বাণীপ্রসাদ তার অল্পদিনের মধ্যেই Ph.D. শেষ করে দেশে ফিরে যান, প্রশান্ত সান্যা পরে Case Western Reserve বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করে আমার মতো পাকাপাকিভাবে এখানে থেকে যান। তবে রণন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এসেছিলেন চাকরি নিয়ে, যেমন এসেছিলাম আমি। এঁদের সকলেরই বাস ছিল Universityর কাছাকাছি। আমি থাকতাম East Clevelandএ। শহরের পশ্চিমে বাঙালীরা কেউই থাকতেন না। I 480 ছিলনা, 271এরও কাজ বাকি, কাজেই আমরা পশ্চিমে যেতাম Lake Shore Drive ধরে। দক্ষিণের Route 8 ধরে Turnpikes পড়ে তবে যাওয়া হত যেমন ধরা যাক শিকাগোয়।

বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার আনুষ্ঠানিক পত্তন ১৯৭১এ, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে। আমার যতদূর জানা, বলতে গেলে উত্তর আমেরিকার সমস্ত বাঙালী সংঘেরই জন্ম ঐ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। আর হিসেব করে দেখলেই এটা বোঝা যাবে, কেননা প্রত্যেকটিরই এখন মোটামুটি ২৫ বছর পূর্তির সময়। আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন শুরু হয় নিউ ইয়র্কে, বাংলাদেশীদের উদ্যোগে।

ক্লীভল্যানডে এর ঢেউ এসে পৌঁছায় ১৯৭১, অস্থায়ী Bengal Relief Fund খুললে। তার উদ্যোক্তা ছিলেন রণন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি নিজে সে সময়টা দু বছরের জন্য প্যারিসে বদ্‌লি হয়েছিলাম, ৭১এর অক্টোবরের শেষে

ফিরে দেখলাম পুরোদমে relief fundএর কাজ চলছে। টাকা তোলা হচ্ছে, লোকজনকে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা হচ্ছে। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ সংগ্রহে লেগে পড়েছিলাম। Mallএ mallএ বা অনুরূপ অন্যান্য জায়গায় চাঁদা তোলা হত। লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল, উনি নিজে রান্না করে fund raising dinnerএর ব্যবস্থা করতেন। মিউজিয়ামের সামনে গিয়ে পিকেট বা প্যারেড করাও হত। এতে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে মিহির ও মঞ্জুলা দত্তের নাম উল্লেখ্য, ততদিনে -- বোধহয় ১৯৬৯ থেকে -- এঁরাও ক্লীভল্যানডবাসী হয়েছেন। আর সক্রিয় ছিলেন সুকুমার রায়। আরেকজন অনেক কাজ করেছিলেন আমাদের মধ্যে, তিনি হলেন বারবারা চ্যাটার্জি। সুদূর Ada থেকে গাড়ী চালিয়ে আসতেন অমর ভটাচার্য, Oxford (Miami) থেকে জ্ঞান ভটাচার্য। তাছাড়া কিছু বাংলাদেশের লোকও ছিলেন ১৯৭১এ। আমাদের পরেই তাঁদের আগমন ক্লীভল্যানডে। তাঁরাও খুবই তৎপর হয়েছিলেন এ কাজে। এঁদের মধ্যে বদিউল আলম মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এখন সিয়াটেলে আছেন, যতদূর জানি। বছর দুই আগে অবধিও আমার সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগাযোগ ছিল। অল্পবয়েসীদের মধ্যে অগ্রণী ছিল আলম আর তার স্ত্রী রুবি, এখন মিনেসোটায় আছে। তাছাড়া, Caseএর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের জনৈক অধ্যাপকও (নামটা মনে করতে পারছিনা) অনেক কাজ করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। প্যারেড পিকেট ইত্যাদির সংগঠক ছিলেন তিনিই।

সাংস্কৃতিক কোনও অনুষ্ঠান তখনও শুরু হয়নি, মানে বাঙালী হিসাবে তখনও আমরা কিছুই করিনি। এর আগে অবশ্য ১৯৬২তে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়ে ভারতীয়েরা সকলে মিলে fund raising উপলক্ষে Cleveland Institute of Art বা Musicএ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এ অনুষ্ঠানে মার্কিনীরাও যোগ দিয়েছিলেন, master of ceremony হয়েছিলেন ভারতের জন্য সম্প্রতি নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তার ঠিক আগে তিনি দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের প্রথম সচীব (First Secretary) ছিলেন, Chester Bowlse তখন রাষ্ট্রদূত। চাকরি ছেড়ে তিনি তখন তাঁর জন্মস্থান ক্লীভল্যানডে ফিরে এসেছেন। অনুষ্ঠান বলতে গানই শুধু, নাচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। পরিচালনায় ছিলেন লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের জন্য সংগঠিত অস্থায়ী Relief Fund Groupএর কারও কারও গলা শোনা যেত তখন রেডিওয় বা TVতে। Dorothy Fuldheim নামে এক মহিলা-সাংবাদিক তখন একটি TV প্রোগ্রাম পরিচালনা করতেন। Fund raisingএ যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তারা এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন। একবার রণন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমিও আমন্ত্রিত হয়ে TVর একটি আলোচনানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম।

১৯৭১এর শেষে গিয়ে নিয়মবদ্ধ কাঠামোয় গড়ে উঠল একটা সংগঠন। নাম হল বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা বা Bengali Cultural Society। তার সংবিধান লেখা হল। ১৯৭২-এ আমি সংগঠনকে State of Ohioতে নথিভুক্ত, register, করালাম। যেহেতু সে সময়ে আমাদের মধ্যে দুই বাংলারই অনেক লোক ছিল, আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ওটাকে ধর্ম-সম্পর্কহীন একটা সংগঠনের রূপ দেওয়া। অর্থাৎ ঠিক হয়েছিল, কোনও ধর্মেরই সঙ্গে সংস্থার কাজকর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবেনা। আর সেভাবেই আমরা চালিয়েছিও। তারপর সুনীল দত্ত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরও কেউ কেউ (সকলের নাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছেনা) পূজো করার জন্য উৎসাহ দেখালেন। আর বাঙালীর সংখ্যাও ততদিনে অনেক বেড়ে গিয়েছে। ঠিক হল, পূজো যদি করতেই হয়, তাহলে সংবিধানটা বদলাতে হবে। সংস্থার সদস্যদের ভোট নিয়ে তা-ই করা হল ও ১৯৭৮এ পূজো শুরু হল। সে বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুনীল দত্ত।

পুরোন দিনের গল্প

শুভা পাকড়াশী

আমার আমেরিকা প্রবাস ক্লীভল্যানডেই শুরু, ১৯৬৫তে আমি সরাসরি দেশ থেকে Cleveland Clinicএ Dr. Robert Smebyর কাছে post doctorate করতে আসি। ভদ্রলোক নিজেই আমায় তুলে নিয়ে এসে যে হোটেলটিতে উঠিয়েছিলেন, তার অবস্থান Clinicএর ঠিক পাশে। একা হোটেলের ঘরে, প্রথম দিন রাত্রে সে ঘরের জানালা দিয়ে নীচে কারনেগি সড়কে দেখি দুটি কৃষ্ণাঙ্গ মারামারি করছে, বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে একে অন্যকে তাক্ করে।

অভিনব অভিজ্ঞতা, ভীতিকরও বটে। আমিও তো ভয়ে দরজা খুলে বেরোতেই সাহস পাইনি সে রাত্রে।

সেটা ছিল শুক্রবার। পরদিন, অর্থাৎ শনিবার সকালে ভীষণ খিদে পেয়েছে, প্রাতরাশ সারতে যাব নীচে, কিন্তু আবার ধাক্কা। দরজাটা যেই না খুলেছি, দেখি একটি midget, অর্থাৎ বামন, দাঁড়িয়ে সামনে। সে আবার আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একগাল হাসল! জীবনে সামনাসামনি এই প্রথম এরকম একটি লোককে প্রত্যক্ষ করা। কিছুই না, কিন্তু আমার এতো ভয় লেগে গেল যে about turn করে আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ভাগ্যে দেশ থেকে আনা কিছু সন্দেশ ছিল সঙ্গে, তাই খেয়েই কাটল সে সকালে হোটেলে।

তারপর টেলিফোনের বইএর পাতা উল্টোতে শুরু করলাম, যদি কোনও বাঙালির নাম চোখে পড়ে। "A" থেকে শুরু করে "G"তে গিয়ে তবে ঘোষাল পদবীর দেখা পেলাম। Case Westernএর Physiologist অমিয় ঘোষাল, বর্তমানে Torontoর Sick Children's Hospitalএ কর্মরত। তাঁকে ফোন করলাম। ততদিনে শনিবার কেটে রবিবারে পড়েছি।

অমিয়বাবু এসে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি ওঁর বাড়ীতে গুটি চারপাঁচ বাঙালী এসেছেন। ক্লীভল্যানড প্রবাসী বাঙালী বলতে তখন আট দশ ঘর। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রণজিৎ দত্ত, রণন আর লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সুকুমার রায়।

তখন বাঙালী ছিল ঐ ক'জনই, তাই এখনকার চাইতেও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশাটা ছিল বেশী। তবে, এটাও ভুললে চলবেনা যে আগের তুলনায় কম হলেও আজও ক্লীভল্যানডের বাঙালীরা অন্যান্য অনেক জায়গার প্রবাসী বাঙালীরই তুলনায় আজও ঘনিষ্ঠ।

সব বাঙালীই তখন ছিলেন শহরের পূর্বদিকের বাসিন্দা: পশ্চিমের এলাকাগুলোর আজকের মতো উন্নতি হয়নি, বিস্তার তো নয়ই। যেমন, Westlake অঞ্চলটাই তখন ছিলনা। আর, রণন আর লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিংবা অমিয় ঘোষালের বাড়ী ছিল আমাদের সপ্তাহান্তে মিলবার জায়গা।

পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৬৬তে ক্লীভল্যানডে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ দলের মধ্যে দাংগা বাঁধল, তাতে শ্বেতাঙ্গেরা নাক গলিয়ে আরও ঘুলিয়ে তুলল ব্যাপারটাকে। প্রচণ্ড মারামারি চলেছে। সে মারামারি থামাতে এমনকি হেলিকপটার থেকেও গোলাগুলি চালাতে হচ্ছে। সে এক এলাহি কাণ্ড। বলা বাহুল্য, Clinicএর পাড়াকে তার ধকল পোয়াতে হয়েছিল ভীষণ রকম, আর আমি দিন কাটিয়েছি ভীষণ দুশ্চিন্তায়। তবে, তার অল্প দিনের মধ্যেই নতুন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র Carl Stokes এসে সব ঠাণ্ডা করে দিলেন।

আগে কিন্তু এ শহরে এরকম ঘটনা অপ্রত্যাশিত ছিলনা। অনেক বিপত্তি গেছে তার উপর দিয়ে। মারমারি তো ছিলই, তার উপর শহর একবার দেউলিয়া, bankruptও হয়ে গিয়েছিল। সে তুলনায় আজকের ক্লীভল্যানডকে শান্ত-শিষ্টই বলতে হবে,

আমি আবার গোড়ায় বাড়ী নিয়েছিলাম একেবারে Clinicএর পাশে, যাতায়াত করতে সুবিধা হত তাতে। তার পর আরও পুবে মাইল তিনেক সরে গেলাম। তার পর আরও তিন মাইল। এই করতে করতে এখন তো একেবারে দূরপ্রাচ্য!

আমি যখন আসি, তখন বারোয়ারিভাবে এখানে কোনও অনুষ্ঠান, পুজোই হোক বা অন্য কিছু, তা হতনা। আমরা লেখাদির অথবা অমিয় ঘোষালের (ওঁর স্ত্রীকে আমরা বৌদি ডাকতাম) বাড়ীতে পুজো হলে সেখানে যেতাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ কিছুই ছিলনা, তবে লেখাদি WCLVতে একটা রেডিও অনুষ্ঠান চালাতেন, আমরা তাতে কখনও কখনও গান করেছি। তার একটা টেপ এখনও আছে আমার কাছে। ইংরিজিতেই অনুষ্ঠান, কিন্তু তাতে বাংলা গানের জন্য একটা slot ছিল।

যখন বাঙালীর সংখ্যা বাড়ল, তখন রণনদার বাড়ীতে বসেই রণজিৎ দত্ত ও অন্যান্য কয়েকজন ঠিক করলেন, ছোট করে একটা বাঙালী সংঘ দাঁড় করানো যাক। রণনদারই নেতৃত্বে সেটা শুরু হল তারপর। বলে রাখি, এ উৎসাহের অনেকটাই এসেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দুই বাংলা থেকে আগত প্রবাসী দেশবাসীর সহায়তার প্রয়োজন থেকে। সংঘ হল, আর পরের বছরই তাকে রণজিৎ দত্ত রেজিস্ট্রি করালেন। সেটা ১৯৭১ সাল।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই association গঠনে বদিউল আলম ও তাঁর স্ত্রী নাকি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। রণনদা সহ এঁরা সকলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে হাত মিলিয়েছিলেন। আমি তখন সবে এসেছি, কাজকর্মে ডুবে আছি। তাই এসব উদ্যোগে খুব সামিল হতে পারিনি।

FICA হল যখন, আমিই ছিলাম তার প্রথম চেয়ারপারসন। প্রস্তাবটা এসেছিল ক্লীভল্যানডের গুজরাতি, তামিল, বাঙালী ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠীর সমিতিকে এক ছাতার নীচে জড়ো করার প্রয়োজন বোধ করে। তখন Indian Association of Cleveland নামেও একটা গ্রুপ ছিল। সমস্যা ছিল, কে কোন দলের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করবে। একসঙ্গে মিলি, এ ইচ্ছাটা কিন্তু সকলেরই ছিল।

তখন তিনজন উৎসাহী ভারতীয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিলেন, সমস্ত গোষ্ঠীরই একজন একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় সমিতি সংগঠন করা যাক, যাতে সকলেরই সঙ্গে বাকি সকলের যোগাযোগ থাকে। এরকম একটা সমিতি থাকলে সকলেরই পক্ষে অনুভব করা সম্ভব হবে যে আমরা একটি ভারতীয় গোষ্ঠীরই অন্তর্গত। এঁদের নাম ছিল, নরেন বক্সী, কানু প্যাটেল, আর বালসুব্রাহ্মণ্যম্।

কখনও ইউনিভার্সিটির পিছনে Magnolia Drive নামে একটা ছোট ঘরে, কখনও একটি গীর্জার বেসমেন্টে আমরা সপ্তাহে একবার করে জমায়েৎ হতে শুরু করলাম আমরা। এরই মধ্যে মহেশ প্যাটেল নামে একজন ভারতীয় আফ্রিকা থেকে এসে ক্লীভল্যানডে বসবাস শুরু করলেন। আর এসেই নবজাত সঙ্ঘটিকে একটা মস্তবড় অঙ্কের টাকা দান করবেন অঙ্গীকার করলেন, বললেন, দশবছর ধরে প্রতি বছর পাঁচ হাজার ডলার করে দিয়ে যাবেন। কিছু টাকা পাওয়া গেল ডাক্তার বাফনার কাছ থেকে, তিনি এখনও এ শহরেরই বাসীন্দা। আর পরিবারপ্রতি প্রাপ্ত অর্থসাহায্য তো ছিলই। সেই টাকায় তারপর Indian Community Centerএর বর্তমান বাড়ীটি কেনা হল। আগে এটি ছিল Sun Pressএর বাড়ী ওরা বিক্রি করতে চাইছিলেন। দাম পড়েছিল ৭৮,০০০ ডলার। চেকটা আমারই হাত থেকে পেয়েছিল Sun Press।

Indian Association of Clevelandএর প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন সুরিন্দর কাপ্পানি, আইনজ্ঞ ধর্মিন্দর কাপ্পানির দাদা। আর আমাকে করা হল FICAর প্রেসিডেন্ট।

১৯৮৬ সালে ষষ্ঠ বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলন তো স্লীভল্যানডেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, রণজিৎ দত্ত আর আমি হয়েছিলাম কো-চেয়ারপারসন। পাঁচশ লোক হয়েছিল -- আমাদের কাছে যে সংখ্যা ছিল বিপুল। আজকের সংস্কৃতি সম্মেলনগুলোয় যে সকলে মিলে এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে, তার সূত্রপাত স্লীভল্যানড থেকেই। আগে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের auditorium ভাড়া করে সম্মেলন হত। স্লীভল্যানডে সম্মেলন হয়েছিল John Carroll Universityতে, সেইসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা John Carrollএরই dormitoryতে। সকলের এতো ভালো লেগেছিল যে সেটাই তারপর ট্র্যাডিশান হয়ে দাঁড়ায়, যা আজও চলেছে।

তাছাড়া Fifth Biennial Convention of Asian Indians in North America and Canadaও হয়েছিল এখানে। তাতে অবশ্য শুধু বাঙালীরাই নয়, সকলেই সামিল হয়েছিল। সারা আমেরিকা থেকে ভারতীয়েরা জমায়েৎ হয়েছিলেন তাতে। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল, ঐ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনেরই মতো। হয়েছিল শহরের পূর্বাঞ্চলের ম্যারিয়ট হোটেলে।

দুর্গা পূজোর পত্তন করেছিলেন সুনীল দত্ত, ছোট একটা শহরে পূজো শুরু করা গিয়েছিল, আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম।

আগে মার্কিনীরাই এসে নাচগান করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে -- বাঙালী কোথায় তখন? বারবারা চ্যাটার্জি নামে এক মহিলা ছিলেন সে সময়ে, তিনি খুব উৎসাহ নিতেন। আর ছিল লিনডা, সেও খুব উৎসাহী ছিল।

আর একজন যিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, তিনি ছিলেন বাঙালিনী নন্দা দত্ত। অসাধারণ প্রতিভা। চণ্ডালিকা নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল এখানে পুরো ওর পরিচালনায়। ওঁর কাছে স্লীভল্যানডের বাঙালী সমাজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ঋণী।

আরেকজন প্রতিভা ভারতী চৌধুরী, শান্তিনিকেতনে মানুষ, শিল্পী। তাঁরই হাতে গড়া আমাদের দুর্গা প্রতিমা। আমাদের দেশ থেকে প্রতিমা কিনে আনতে হয়নি।

সেই ৬৫ থেকে ৩১ বছর পেরিয়ে আজ কত কথাই মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে মনে পড়ে এঁদের কথা।

(অনুলিখন: কল্যাণ দাশগুপ্ত)

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমারে যে পিছু ডাকে ...

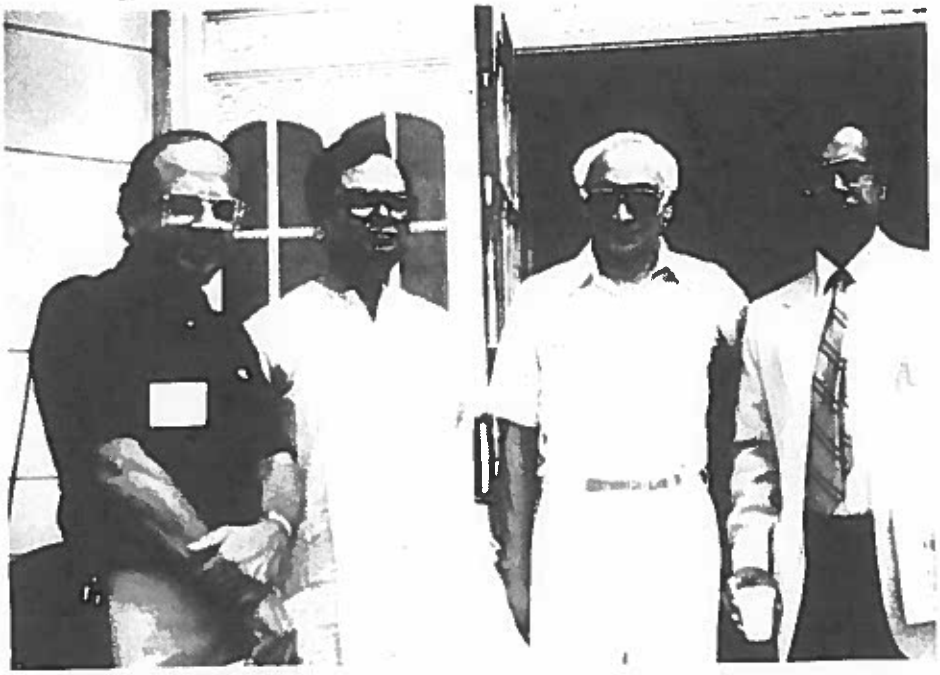

PROGRAM SCHEDULE

Bengali Cultural Society
Silver Jubilee Celebration, 1972-1997

Friday, July 25, 1997

7:00 PM	Mela opens - refreshments served
8:00 PM	Welcome Addresses
8:30 PM	Invocation - Amiya Banerjee and group
8:50 PM	***Sorsé*** - A Bengali drama performed by the Pittsburgh group
9:30 PM	Modern Bengali songs - Suman Chattopadhyay from Calcutta
12:00 AM	Curtain

Saturday, July 26, 1997

9:30 AM	Mela opens - Photographic Exhibitions, Stalls open
10:00 AM	Instrumental music, songs - Guest Artists
11:00 AM	Panel Discussion: ***Bhojanbilashi Bangali***
	Panelists: Chitrita Banerji, Krishnendu Ray, Ranajit Datta,
	Moderator: Kalyan Dasgupta
	Book (***Bengali Cooking***) Signing by Chitrita Banerji
12:00 PM	Lunch
1:00 PM	Children's Orchestra
1:15 PM	***Bangla Kabita*** - Cleveland
1:45 PM	***Elem Notun Deshe*** - Dance Medley - Cleveland
2:30 PM	Square Dance
2:45 PM	Break
3:00 PM	***Rakta Karabi*** - A Bengali Drama performed by the Cleveland group
4:15 PM	Curtain
7:00 PM	Refreshments and *Adda*
8:00 PM	Banquet Dinner
9:00 PM	***Khudito Pashan*** (Hungry Stones) - A Kathak Dance Drama by Nritya Jyoti Dance Theatre, Choreographed by Rita Mustafi - Main Auditorium
	Jam Session for Young Adult and Entertainment for Young Children
11:30 PM	Curtain

Sunday, July 27, 1997

10:00 AM	Mela opens
10:15 AM	Songs - Cleveland Group, Music Direction by Rama Banerjee, Pittsburgh
10:45 AM	Dance
11:15 AM	Memories - Children's Program - Bengali Cultural Society Cleveland
11:45 AM	Bengali Songs - Rejwana Banya Chaudhuri from Bangladesh
1:30 PM	Lunch

The Program Schedule is tentative. Please check the final schedule on your arrival.

স্মৃতিটুকু থাক ...

ক্লীভল্যান্ড - প্রাক--সম্বর

রণনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লীভল্যান্ডে আমার পাকাপাকি বসবাসের সুরু ১৯৬১ সালে। (এর আগে ১৯৫৯এ একবছরের জন্য বুড়ি ছুঁয়েছিলাম)। সেখান থেকে ফিলাডেল্ফিয়া আসি ১৯৭৩ সালে। ওখানকার কিছু পুরোন বন্ধুর সঙ্গে এখনও আদান-প্রদান চলে। আরও অনেকের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল যাঁদের সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎ নেই। অনেকে আমেরিকা থেকে চলে গেছেন, কেও দেশে, কেও অন্যত্র। সহর ছেড়েছেন অনেকেই। সকলকে স্পষ্ট মনে আছে, এমন দম্ভও করতে পারিনা। কাজেই এই নির্বন্ধ লিখতে বসে এই ভয়টা সবচেয়ে বেশী মনে জাগছে যে কাকে বা অসম্মান করে বসি নাম করতে ভুলে। তাই ঠিক করেছি নাম কারও করবনা।

১৯৫৯ সালে আমাদের চেনা মাত্র একঘর বাঙ্গালী ছিলেন, এইরকম মনে পড়ছে। ১৯৬১ সালে তাঁরা ছিলেননা, কিন্তু ততদিনে সহরে অরও বাঙ্গালী কিছু পৌঁছে গেছেন। দু-এক বছরের মধ্যে পরিচিত বাঙ্গালীর সংখ্যা আরও বাড়ল। প্রথমে যাঁরা ছিলেন প্রায় সবাই অবিবাহিত - কেও গবেষক, কেও ছাত্র। পরে সপরিবার কিছু এলেন, পুরোন লোক কিছুকালের জন্য ফিরে এলেন আবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এলেন।
তখনও সমাজ এতো ছোট যে নতুন কেও এলে মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে যেত। যোগটা থাকত সেই ভাবেই। সামাজিকতা বলতে এ ওর বাড়ী যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, এটুকুই ছিল - যদিও তার মুল্য আদৌ কম ছিলনা।
ইতোমধ্যে একটি অতি কর্মঠ ছাত্রের উৎসাহে সরস্বতী পুজোর কথা উঠল। এর আগে ও ধরণের কাজে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিলনা। ছেলেটির নির্বন্ধাতিশয্যে পুজো করতে রাজী হয়ে গেলাম। সেই ছেলেটিই কালিফোর্নিয়ার রামকৃষ্ণ মঠ থেকে মন্ত্র এবং কর্মপদ্ধতি এনে দিল। উপচার কোথা দিয়ে সব যোগাড় হোল আজ আর মনে নেই - পরে দেশে গিয়ে কিছু কিনে এনেছিলাম। বাড়ীর পুজো হিসেবেই আমাদের বাড়ীতে পুজো হোত। ততদিনে (বিশেষ করে নতুনদের মধ্যে) সকলকার সঙ্গে আর আর চেনা থাকছেনা। কিন্তু পুজোর খবরটা সকলের মুখে ছড়িয়ে দেওয়া হোত। লোকমুখে জানতে পারত সবাই, এবং আসত পুজো দেখতে। পুজোর সময়ে নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেত। বারোয়ারি করার প্রয়োজন কিছু বোধ হয়নি। সমাজ তখনও ছোট। দুর্গাপুজোর কথা তখন ভাবতেও পারতামনা আমরা। ছেলেমেয়ে কারোই বড় হয়নি - বিবাহাদি সংস্কারের কথাও কেও ভাবেনি। যাঁরা ছিলেন, দীর্ঘকাল এদেশে থাকবার ইচ্ছা তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ছিল। কাজেই কোন স্থায়ী সংস্থা গড়বার প্রয়োজনও কেও বোধ করেনি।

প্রয়োজন বোধ করা গেল ১৯৭১ সালে যখন ঢাকায় শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পর সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী ফৌজের অমানুষিক অত্যাচার সুরু হোল। বাঙ্গালীরা কয়েকজনের বাড়ীতে সভা ডেকে সবাই মিলে স্থির করলেন যে এ ব্যাপারে আমাদের নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। কী করা উচিত, সে সম্বন্ধে নানা জল্পনা হল। মোটামুটি পাওয়া গেল এই কটা: ১) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাঁরা এদেশে আসছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। ২) আমেরিকা সরকার যাতে পাকিস্তানকে অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত হবার জন্য চাপ দেন, তার চেষ্টা করা। ৩) বাংলার মুক্তিফৌজকে আর্থিক সাহায্য করা এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করার চেষ্টা করা।

সব ব্যাপারেই সকলকে একমত করা যায়নি। তখন আমাদের মধ্যে মর্কিন নাগরিক খুব কম ছিলেন। আবাসিক যাঁরা, তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেননা: অনেকে ভয় পাচ্ছিলেন যে রাজনৈতিক কাজে অংশ নিলে তাঁরা আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হতে পারেন বা গ্রেফতার হতে পারেন। অনেকে এ-প্রশ্নও তুলতে লাগলেন যে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার মধ্য দিয়েই যখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম, তখন সেখানকার দাঙ্গা নিয়ে ভারতের বাঙ্গালীদের মাথা ঘামাবার কোন অর্থ হয়না। এইসব বিতণ্ডার ফলে বান্তহারাদের অর্থসাহায্যটুকুই শুধু করা গেল গোড়ার দিকে। সেখানেও প্রশ্ন উঠল, টাকাটা কার মাধ্যমে কোথায় পাঠান উচিত। শেষ অবধি কী রফা হয়েছিল খুব একটা মনে নেই। তবে কিছু কাজ হয়েছিল সেটা মনে আছে। অরেকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ঘটেছিল সেটা এই যে সব সভ্যদের দায়িত্ব এবং সংস্থার অধিকারের সীমা নিয়ে সাবধানে bye-laws লেখা হয়ে গেল (এর বিহনে সব বাঙ্গালীর সমযোগিতা পাওয়া যেতনা)। এইখানে একটা formal সংস্থার গোড়াপত্তন হোল।

স্কীভল্যান্ডের বাঙ্গালীর সমিতির আরম্ভের ইতিহাস এইখানেই প্রায় শেষ - আমার জানে এর বেশী প্রায় নেই। তবু এ গল্পটা বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত না টানলে বোধহয় অন্যায় হবে।

সমিতির কাজ যখন শুরু হয়েছে, সেই সময় বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক এলেন। আমাদের কাজের মাধ্যমে আমেরিকার অন্য বাঙ্গালীদের কাজকর্মের খবর পাওয়া যেতে লাগল। বড় খবর পাওয়া গেল যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। লন্ডনে পুরোন পূর্ব পাকিস্তানের হাই কমিশনারের অফিস নাম বদলে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজদূতাবাস হয়ে গেছে। একজন বৈজ্ঞানিক কাজে ইয়োরোপ গেছিলেন, তিনি লন্ডনের রাজদূতাবাস থেকে বাংলাদেশের কিছু খবর ও উপদেশও নিয়ে এলেন। এই সময়ে ঢাকা ফেরত কিছু মার্কিন ডাক্তার ওয়াশিংটনে Bangla Desh Information Center নাম দিয়ে অফিস খুললেন মার্কিন সরকারকে বাংলার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করার জন্য। আমাদের মধ্যে মার্কিন নাগরিক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এই অফিসকে সাহায্য করবার জন্য মাঝে মাঝে ওয়াশিংটন যেতে লাগলেন। সংস্থা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে কিনা, এ নিয়েও কিছু বিতণ্ডা হোল (সেই রাজনীতিগত ভয়)।এমন কথাও কেও কেও বললেন যে Congressএ lobbying করা একটা অর্থহীন কাজ। Bye-lawsএর প্যাঁচ কাটিয়ে সে কাজও চলল কিছুটা। সুফল এই হোল যে ওয়াশিংটনে কাজ করবার ঘাঁত-ঘোঁতগুলো আমরা কেও কেও কিছুটা শিখলাম। ওখানকার congressmanদের যেসব কর্মচারীরা আমাদের কাজে সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতাও হোল খানিকটা। স্কীভল্যান্ডের লোকেদের এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য নানা উপায় করা হোল। রেডিও-টেলিভিশনের লোকেদের সঙ্গেও কিছু পরিচয় হোল; অর্থাৎ স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটা যোগসূত্র গড়ল। এর ফলে পরবর্তী কালে ভারতীয় কৃষ্টিকে মার্কিনীদের কাছে পরিবেশনে আমাদের সুবিধা হয়েছিল। দুটো রেডিও-প্রোগ্রাম ছিল: একটা সিধে ভারতীয়দের জন্য, অন্যটা মার্কিনীদের কাছে ভারতীয় সংগীত-কৃষ্টির পরিচয় দেবার জন্য। ওই যোগগুলো এখনও অক্ষত আছে কিনা সে খবর আমি জানিনা।

আসল গল্পে ফিরে এসে বলি যে আমাদের ওয়াশিংটন যাত্রার প্রত্যক্ষ ফল খুব বেশী হয়নি। নিক্সন সাহেবের পাকিস্তানের ওপর পুরো নেক-নজর ছিল নানা কারণে। তাছাড়া কিসিংগার সাহেব প্রথম বার চীনে গেছিলেন পাকিস্তানেরই সহায়তায়। ফলে যদিও প্রচুর congressmanএর সহানুভূতি পাওয়া গেল, কিন্তু যা আমরা চাইছিলাম তা হোলনা। ইতোমধ্যে আমাদের দলে কিছু অবাঙ্গালী ভারতীয়দের ও মার্কিন ছেলেদের পাওয়া গেল। বাংলা দেশের লোক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা মুক্তি ফৌজকে করার ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত ছিলেন। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকও ছিলেন বেশ কিছু। কিন্তু bye-lawsএর পাঁচ কাটানো গেলনা। ফলে শুধু ওই কাজের জন্য একটা অস্থায়ী সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দুই সংস্থার সম্পর্ক কী হবে এ নিয়ে নানা মনোমালিন্যের সৃষ্টিও হয়েছিল। অবশ্য এ ব্যাপারগুলো নিজেই সামলে গেল যখন ভারতীয় ফৌজ ঢাকা অধিকার করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করল্ - মুক্তিফৌজের ছেলেরা সব ঘরে ফিরে এল। সে ইতিহাস থাক এখন। মূল কথা এই যে এর পরেও সংস্থাটা রয়ে গেল এবং এর ভিত্তিতে বাঙ্গালীদের কর্মক্ষেত্রটা সুপরিসর হোল। সে খবর আমার চেয়ে বর্তমানের লোকেরা বেশী জানে।

একটি বাঙালিনীর ক্লীভল্যানডের অভিজ্ঞতা

মরণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা প্রথমবার ক্লীভল্যানডে যাই ১৯৫৯এর সেপ্টেম্বর মাসে __ আমার স্বামী Case Institute-এ পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষে। সেবার ক্লীভল্যানডে চার বছর ছিলাম। তখনকার দিনে দুটি ছোটছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কলেজের assistantshipএর আর্থিক টানাপোড়েনের সীমিত সুযোগের মধ্যে ক্লীভল্যানডকে যতটা চেনা ও দেখা সম্ভব, তা মোটামুটি দেখেছিলাম। তারপর একাধিকবার আমেরিকা গেলেও ক্লীভল্যানডে বেশীদিনের জন্য যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বছর তিনেক আগে আবার আমাদের ক্লীভল্যানডে যাওয়া হয়, আমাদের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে। এবার আমরা মাত্র তিনদিন ছিলাম শহরের পশ্চিমাঞ্চলে, বিয়ের উৎসবটা যদিও অনুষ্ঠিত হয় পূবে।

আমরা যে সময়ে প্রথম আমেরিকা যাই, সেই সময়কার পটভূমিকা যৎসামান্য উল্লেখ করা দরকার। একটা দেশ বা স্থান তো আর কিছু বাড়ি, পথঘাট আর মিউজিয়াম ইত্যাদি দিয়ে নয়, সেখানকার মানুষই তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওখানকার মানুষের কাছে বাইরের জানালা খুলে গেল। তার আগে, আমেরিকার মাটিতে কোনওদিন যুদ্ধ না হওয়ায় সে দেশের মানুষ একটা self-created isolationএর ভিতরে ছিল। আমরা কিন্তু তখনকার মার্কিনীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত naivete লক্ষ করেছি। পথেঘাটে বা কোনও পার্টিতে বা যে কোনও জমায়েতে আমাদের তারা জিজ্ঞাসা করত "What do you think of the American way of life" বা "Do you like us? What about the aid we are giving you?" ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে আছে, আমার স্বামীকে বহু জায়গায় তঅলক দিতে হত, বলতে হত, ও aidটা আসলে সবই aid নয়, অনেকটাই aid with a string। আমাকেও বিভিন্ন জায়গায় women's groupএর কাছে talk দিতে হয়েছে, Indian way of life religion, custom ইত্যাদি নিয়ে, তখনই ইঙ্গিত পেয়েছি বিশেষত প্রাচ্য দেশগুলো সম্পর্কে ওদের অজ্ঞানতার।

আমি যখন ভারত ছাড়ি তখন যদিও কাগজে কলমে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবুও জীবনযাত্রায় ইংরিজি প্রভাব খুবই গভীর। কাজেই ওখানে গিয়ে কোনও কিছুই আমার কাছে দারুণ অপরিচিত মনে মনে হয়নি, ওদেশের life styleএ নিজেকে মানিয়ে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

১৯৫৯এ যখন গেলাম, তখন ওখানে আর একটি বাঙালী পরিবার ছিল, রণন ও লেখা ব্যানার্জির পরিবার। কিছুদিন বাদে এঁরা অন্যত্র চলে যান। ইতিমধ্যে Cleveland Council on World Affairs নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাদের সৌজন্যে বেশ কিছু মার্কিনী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। আমার তখনকার একাকিত্ব মোছাতে তাদের অবদান অসীম। এঁরা সবাই ছিলেন Shaker Heights ও Moreland Hillsএর অবস্থাপন্ন বাসীন্দা। এমন একটা weekendও মনে পড়েনা যখন আমরা এদের কারও না কারও বাড়ীতে যাইনি অথবা এঁরা কেউ আমাদের বাড়ীতে আসেননি। মনে আছে, ছোটদের জন্যই মাঝেমাঝে শ্যাগরিন ফলস্ কি এমারেল্ড নেকলেসের বিভিন্ন পার্কে burlesque হত, এদের সঙ্গে সেখানে যাওয়া ছিল। এদের সবার সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা আমরা দেশে ফেরার পরও অটুট থেকেছে। আবার আমেরিকা গেলে তাদের অতিথি হয়ে থেকেছি, পুরোন দিনের গল্পে আনন্দে সময় কেটেছে।

তবে এর মধ্যে আমার বয়েসের কাছাকাছি হওয়ায় Susan Naegele আর Anita de Perillaর সঙ্গে গভীরতর সখ্যতা হয়েছিল। স্টসঅন জার্মানীর মেয়ে। ওর স্বামী Dr. Philip Naegle প্রিনস্টন থেকে সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু বাজনা বাজাতে ভালো লাগত বলে Severence Hallএর সঙ্গীত পরিচালক George Szellএর পরিচালনায় Cleveland Orchestraয় first violinistএর জায়গা নিতেন। এঁরা ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। সুইডেনের মেয়ে Anitaর স্বামী Oscar British Columbia আগত, সে ছিল আমার স্বামীর সতীর্থ। এদের সঙ্গে বহু বিকেল আনন্দে কাটিয়েছি পার্কে পার্কে। মনে পড়ে এক হাঁটু বরফের মধ্যে আমরা Downtownএ Halley, Higby, May ইত্যাদি দোকানে window shopping করছি। এই দোকানগুলো এখনও আছে কিনা জানিনা।

এদিক ওদিক ছড়িয়ে প্রচুর specialty shop ছিল। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি ইহুদী pastryর দোকানে যেতাম গরম গরম pastry আর croissant কিনতে। এখন শুনি মাছের ছড়াছড়ি, তখন কিন্তু ইহুদী পাড়া ছাড়া carp আর buffalo মিলতনা। সুপারমার্কেটে চিড়িয়াখানায় সীল মাছদের খাওয়াবার জন্য Erie থেকে ধরা smelt মাছ পাওয়া যেত। যারা সে মাছ বিক্রী করত, তারা বোধহয় ধারণাও করতে পারেনি যে সেই মাছই বাড়ীতে এনে আমরা ঝোল রান্না করে খাচ্ছি।

বিদেশী ছাত্র হওয়ায় কতগুলো সুবিধে ছিল। আমরা খুব কম দামে Severance Hallএর টিকেট পেতাম। সেখানেই Rubinstein, Pablo Casal, Serkin ইত্যাদির বাজনা শুনেছি। তখন এসব concertএ floor length gown পরার প্রচলন ছিল, এখন আছে কিনা জানিনা। তার ভিতর আমার শাড়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও প্রশংসিত হয়েছে, তাতে আমার ভালোই লেগেছে।

যা দৃষ্ট নয়, তা-ই অদৃষ্ট, আজকের Indian Community Center, যখানে আমার ছেলে-বৌমার reception হল, তার পাশেরই supermarket ছিল আমাদের যাতায়াত, আর তার গা দিয়ে যে রাস্তাটি, সেখানেই ছিল আমাদের বাস। যখন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ওখানে বাজার করতে আসতাম, তখন কি ভাবতেও পেরেছি যে এখানেই একদিন একটি আনন্দে মিলন সন্ধ্যায় সবার সঙ্গে আমরা মিলিত হব?

প্রসঙ্গত, তখনকার কিছু কিছু জিনিসের দাম শুনতে বোধহয় মজাই লাগবে। Gasoline ছিল ২১ সেন্টে গ্যালন, ground meat ২৩ সেন্টে পাউনড, চিকেন ১৯ সেন্টে পাউনড!

আমার স্বামী তখন মাসে ৮০০ ডলার ছাত্রবৃত্তি পেতেন, সেই টাকায় ৯০ ডলার বাড়ীভাড়া দিয়ে, বাচ্চাদের nursery schoolএ ২৪ ডলার মাইনে দিয়ে, আমি নিজে রাত্রে Western Reserve Universityতে পড়ে ঐ টাকায় সংসার চালিয়েছি, কিকরে তা ভাবতে এখন অবাক লাগে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও হীনম্মন্যতা ছিলনা। আমার স্বামীর মার্কিনী ও ইউরোপীয় সতীর্থেরাও একই scholarshipএ সংসার চালাতেন, পুরোন গাড়ী আর supermarketএ বিভিন্ন জিনিসের saleএর খবর তাদেরই কেউ না কেউ যোগাড় করে আনতেন। মনে আছে ৫ ডলারে Goodwill থেকে যে কাপড়-কাচা কলটা কিনেছিলাম, সেটা দেশে ফেরার সময়েও ভালো অবস্থায়ই ফেলে রেখে এসেছিলাম। হয়তো বা এটা একটা সাময়িক পরিস্থিতি ভেবেই অবস্থাটাকে sportingly নিতে পেরেছিলাম।

অনেক কথাই মনে আছে। রাতে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে, তাদেরকে স্বামীদের জিম্মায় রেখে আমরা মেয়েরা প্রিয় Audrey Hepburn ও Garry Cooperএর Love in the Afternoon দেখতে যাওয়া, বাচ্চাদের নিয়ে Ringling Brothersএর সার্কাস দেখা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গরম গরম রোস্ট করা চেস্টনাট খাওয়া, আরও কত কি। আমার মনে হয় ছাত্রজীবনের আর্থিক অপ্রতুলতা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, আমাকে নিয়মানুবর্তী করে তুলেছে। তবে,

কোনও কিছুই অবিমিশ্র নয়। Culture shock যে পাইনি তা নয়, যেমন teenage ছেলেমেয়েদের sex সম্পর্কে preoccupation, মেয়েদের চড়া make up, মায়ের পোষাক দেখে শিস দিয়ে ছেলের মন্তব্য, Oh Mom, you look sexy, আমার কাছে অত্যন্ত repugnant লেগেছে। তবু আমাদের কাছে একনাগাড়ে আমেরিকায় কাটানো একটি আনন্দময় অধ্যায়। আর আজেকের আমি যা, তাতে সেই সময়কার অবদান কম নয়।

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমারে যে পিছু ডাকে ...

What advocacy is appropriate for BCS today? Consider that the status of recognized community brings with it an obligation to engage in the social and political life of the countries to which we have ties. Through hundreds of international fairs and school visits, an earlier generation of Indians raised awareness of and respect for the South Asian immigrant community. Let us now apply the same diligence in civic forums, professional organization debates, and everyday discourse to work for nations in which we can proudly claim membership. In today's 'global village', this obligation extends also to being responsible expatriates and emigrants.

In forming the Bengal Relief Fund in the early 1970s, then sponsoring the secular Indian Community Center later in that decade, Cleveland's Bengalis have recognized that the South Asian diaspora binds together peoples of great diversity - in language, religion, culture, economic class and political boundaries. We can best advocate for social justice in American society by setting the example of inclusiveness and tolerance in our own communities.

When I reflect on twenty-five years of BCS memories and retold stories, I am deeply appreciative of the culture and friendship through which BCS has enriched my life. I hope that twenty-five years from now another BCS generation can not only count personal benefits, but further be proud that BCS has strengthened the broader societies of which we are a part.

The Way We Were ... ...

বাংলাদেশী সদস্যের সংখ্যা ততদিনে এমনিতেই কমে এসেছিল, তাঁরা এরপর সকলেই বিদায় নিলেন। কিন্তু আমাদের পূজো ইত্যাদির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা ওঁদেরও অনেককেই পেয়েছি, যেমন এখনও মাঝেমাঝে পাই।

FICAর জন্ম দিতে প্রথম সভা হয়েছিল বোধহয় ১৯৬৩ কি ১৯৬৪এ। আমরা FICAর অন্তর্ভুক্ত হই বোধহয় ১৯৭৬এ। অর্থাৎ পূজোও শুরু হল আর আমরাও FICAয় ঢুকলাম।

BCS সংগঠিত হলে, প্রথম দিকে আমিও বছর দুই তার হাল ধরেছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে গোপাল দাস, অশোক ভট্টাচার্য, এবং অন্যান্যেরাও এগিয়ে এলেন। নিজেদেরই মধ্যে কাউকে প্রেসিডেন্ট, কাউকে সেক্রেটারি করে কাজ চালানো হত তখন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে আসি। ১৯৬৯এই বোধহয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন এ শহরে। অবশ্য শুধু বাঙালীদের নয়, সমস্ত ভারতীয় সমাজেরই আমন্ত্রনে। ওঁর সঙ্গে ছিল মুম্বইয়ের গোপিকিশেন ও কয়েকজন নাচের লোক। দুর্গাপূজো শুরু হয়ে পর প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে, তার সঙ্গে বরাবরই কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। তার বাইরে আমাদের আমন্ত্রনে ১৯৭৪এ গান গাইতে এসেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র। কণিকা গেয়েছিলেন Case Westernএর Thwing Hallএ, পরে দিবজেন মুখোপাধ্যায়ও ঐখানেই গান শুনিয়ে গিয়েছেন। সুচিত্রার প্রথম অনুষ্ঠান হয় একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ীর party roomএ। এসব অনুষ্ঠানে লোক হত বড়জোর ১৫০।২০জন। ঐ সময়টায়ই আমাদের দেশ থেকে প্রথম গায়ক গায়িকারা এদেশে আসতে শুরু করেন।

সুচিত্রা আবার আসেন ১৯৭৫এ, এবার নাচের দল নিয়ে। তাঁর সেবারকার অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মার্কিন দর্শকদের আকৃষ্ট করতে আমাদের সাফল্য। আমরা চেষ্টা করেছিলাম এদেশী মানুষের কাছে আমাদের সাংস্কৃতিক দিকটা প্রচার করতে। প্রসঙ্গত আবারও একটু পিছিয়ে যাই। সে সময়ে ক্লীভল্যানডে Air Indiaর একটা sales দপ্তর ছিল। রণন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী লেখা তখন রেডিয়োয় WCLVতে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন রাত্রে একটি অনুষ্ঠান করতেন। সে অনুষ্ঠান হত Air Indiaর আর্থিক আনুকূল্যে, এবং তাতে প্রায়ই বাংলা গান বাজানো হত। ক্লীভল্যান্ডের বাঙালী সমাজের গোড়াপত্তনে লেখার অবদান সত্যিই মনে রাখবার মতো।

দু-একজন লেখকও এসেছিলেন সে সময়ে। যেমন বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর)। তারপর ৭৬এ এসেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। নীহাররঞ্জন রায় এসেছিলেন, শংকর এসেছিলেন। তবে, নাচ গানের অনুষ্ঠানের মতো বড় অনুষ্ঠান সাহিত্যিকদের নিয়ে করা সম্ভব হয়নি, কেননা লোকের উপস্থিতির নিশ্চয়তা তাতে ছিলনা। কারও বাড়ীতে চা-চক্রে কিছু ইচ্ছুক শ্রোতাকে নিয়ে ওঁদের কথা শুনেছি আমরা।

কিন্তু খুব বড় কোনও অনুষ্ঠান ১৯৮৬ পর্যন্ত হয়নি। ১৯৮৬তে ক্লীভল্যান্ড উদ্‌যাপিত হল (বোধহয়) উত্তর আমেরিকার ষষ্ঠ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়ে, সঠিক সংখ্যা মনে নেই, কিন্তু কয়েক-শ বাঙালী জমায়েৎ হয়েছিলেন এতে। স্বদেশ থেকে যেসব শিল্পী এসেছিলেন আমাদের আনন্দ দিতে, তার মধ্যে ছিলেন ফিরোজা বেগম। সাহিত্যিক শংকরও এসেছিলেন এ সম্মেলনে।

আমি মনে করি, ক্লীভল্যান্ডের বাঙালীদের কাছে এ সম্মেলনের স্মৃতি নানা কারণেই গর্বের। সেই প্রথম বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে state support পাওয়া গেল। Ohio Stateএর Fine Arts ও Humanities Endowment, এই দুই থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলাম আমরা -- এটা সম্ভব হয়েছিল ১৯৭১এ BCSকে আমরা State of Ohioতে register করিয়েছিলাম বলে। তারপর, সেবারই সর্বপ্রথম সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাচক্রের শুরু। তার

আগে নাচ গানেরই আসরে শুধু আবদ্ধ ছিল ব্যাপারটা। আবার, এ সম্মেলন থেকেই প্রথম শাড়ি গয়না বিক্রিও আরম্ভ হয়। আর, আমরাই প্রথম বঙ্গ সম্মেলনে যোগদানকারীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। ব্যবস্থাটা হয়েছিল জন ক্যারলের ডর্মিটারিতে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পূজো, সবই ভালো, কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা অনেকদিনই ঘোরাফেরা করছে, সেটা হল: এর পর কি? নতুন আইডিয়া, নতুন চিন্তার দরকার। প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিই, এই ক্লীভল্যানডেই রবীন্দ্রনাথও ঘুরে গিয়েছেন। তিনি এখানে একটি বৃক্ষ রোপন করেছিলেন, Shakespeare Gardenএ একটা ফলকে তার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে আমি ১৯৮৫এর সম্মেলনে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটিতে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার কাউকে আমি উৎসাহিত করে তুলতে পারলামনা একদিন সকলে মিলে ঐ বাগানটাতে গিয়ে মিলতে।

পূজোটা ভালো, পূজানুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে সকলের তো পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনার একটা সুযোগ হয়। কিন্তু, তার পর আর যা হয় তা গতানুগতিক। সেই পিকনিক, সেই রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। ঐ যে বারবারা চট্টোপাধ্যায়ের কথা বললাম, ১৯৭১এ আমাদের সংবিধানটা চালু হয়ে গেলে মঞ্জুলা দত্ত, নন্দিতা দত্ত ইত্যাদি আরও কারও কারও সঙ্গে মিলে তিনি নিয়মিত একটা বাংলা শেখার ক্লাস শুরু করেছিলেন। এ ছাড়াও ছিল একটা বংলা বইয়ের লাইব্রেরী। বই সরবরাহের একটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা আছে নিউ ইয়র্কের বাঙালী সংঘের, আমরা মাসে পাঁচ দশ ডলার দিয়ে ১৫৮১০টা বই আনাতাম প্রতি মাসে, পড়া হয়ে গেলে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম, তারপর পরের মাসে আবার বই আসত। আমাদের সেই লাইব্রেরিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যদিও নিউ ইয়র্কের সেই বই সরবরাহের ব্যবস্থাটি আজও বেশ ভালোভাবেই চলছে।

তাছাড়া, ঠিক মনে নেই কবে, তবে কোনও একটা fund raisingএরই পর পর বোধহয়, আমরা Cleveland Public Libraryকে ভারত সম্পর্কিত কিছু বই কিনে দিয়েছিলাম। ওদের library committee সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারলে আমরা কিন্তু ওদের দিয়ে বাংলা বইও কেনাতে পারি, সে অধিকার আমাদের আছে। Cleveland Public Library কিন্তু সদস্যদের অনুরোধে বই কিনে থাকে।

তাছাড়া মাদার টেরেসার অনাথাশ্রম আর মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘর থেকে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে এসেছে ক্লীভল্যানডে, এই দুই দল ছেলেমেয়ে মিলে একটা পিকনিক হয়। আগে ওরা কিছু কিছু বাঙালীকে ডাকত, যাতে এদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা একটু at home অনুভব করতে পারে।

যাই হোক, তাই-ই বলছিলাম, আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য চলে যাচ্ছে পূজোয়। অস্বীকার করছিনা পূজোটা খুবই ভালো। কিন্তু আরও কিছু বেশীতে আপত্তি কোথায় ছিল? এই পুজোটাকে নিয়েই মেতে থাকার প্রবণতাটা কিন্তু শুধু ক্লীভল্যানডেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে ছবিটা এই। বাংলাদেশীরা কিন্তু বেশ কিছু পাঠশালা চালাচ্ছে।

নতুন কিছু করা দরকার ভবিষ্যতের জন্য, দরকার এদেশের লোকজনকেও টানার, শুধু নিজেদের মার্কিনী বন্ধুবান্ধবদেরই নয়, তার বাইরেও। বাঙালীদের এদিকটা ভেবে দেখতে বলি।

(অনুলিখন: কল্যাণ দাশগুপ্ত।)

স্লীভল্যানডের প্রথম দুর্গাপূজা ও অন্যান্য স্মৃতি

সুনীল দত্ত

স্লীভল্যানডে আমরা প্রথম দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করি ১৯৭৮এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য আগেই নিউ ইয়র্কে, বসটনে পূজো হয়েছে, কিন্তু স্লীভল্যানডের প্রথম পূজোয় কিছু অভিনবত্ব ছিল, যার উল্লেখে এ শহর প্রবাসী বর্তমান বাঙালী সম্প্রদায়ও খুশি হবেন বলে আমার ধারনা। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে আর একটু পিছনে ফিরে যাওয়া দরকার।

আমি আমেরিকায় আসি ১৯৬৭ সালে, আর স্লীভল্যানডে বসবাস শুরু করি ১৯৭৬এর অগাস্টে বসটন থেকে। বসটনের Tagore Society of New England থেকে প্রবাসী নামে যে বাঙালী সংঘটির সৃষ্টি হয়, যেটি আজও কর্মতৎপর, তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলাম আমি। প্রবাসীকে কেন্দ্র করে দুর্গা পূজা হত, ১৯৭৪ কি ১৯৭৫ সে পূজোর শুরু, আর যাদের চেষ্টায়, আমি ছিলাম তাদেরও একজন।

আমি আসার আগেও এ শহরে সরস্বতী পূজো কিন্তু হত, তবে বারোয়ারি অনুষ্ঠান নয়, কারও-না-কারও বাড়ীতে আয়োজিত পূজো। তার অবশ্য কারণও ছিল, আমাদের ৭-র বাড়ী তখনও কেনা হয়নি।

আমার আগেই এখানে আমার এক বন্ধু বসবাস করছিলেন স্লীভল্যানডে। তিনি ডক্টর দিলীপ নাথ, এখন অ্যারিজোনায় আছেন। কলকাতার Science Collegeএর রসায়ন বিভাগে আমার দুবছরের সিনিয়ার। দিলীপদার কল্যাণে তখনকার ক্লীভল্যানড প্রবাসী বাঙালীদের অনেকেই জেনে গিয়েছিলেন আমি এ শহরে বদ্‌লি হয়ে আসছি। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত ডক্টর অশোক ভটাচার্য, তিনি ছিলেন ১৯৭৬এ বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট।

১৯৭৬এ যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন (নামটা মনে পড়ছেনা), তিনি হঠাৎ বদ্‌লি হয়ে গেলেন কোথায় যেন। অশোক ভটাচার্য মশায় আগেই দিলীপদার কাছ থেকে শুনেছিলেন, বসটনের প্রবাসী সংঘের নানা কাজকর্মের সঙ্গে আমি কিভাবে জড়িত ছিলাম, তাই আমি স্লীভল্যানডে এসে পৌঁছাতে-না-পৌঁছাতেই আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নিলেন তিনি। এদিকে আমি তো এ শহরের বাঙালীদের মধ্যে তখন চিনি শুধু দিলীপদাকে আর ডক্টর শুভা সেনকে (Science Collegeএই ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়)। তা-ও অশোক ভটাচার্য আমাকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নিয়েছিলেন সে বছর।

সেই সময়েই নানা মিটিংএ কথা শুরু হয়েছিল স্লীভল্যান্ডে দুর্গা পূজোর সম্ভাবনা নিয়ে। বসটনের পূজোর অভিজ্ঞতা থেকে আমারও কিছু-না-কিছু বক্তব্য থাকতই এসব আলোচনায়। এতে করে মোটামুটি স্থিরই হয়ে গিয়েছিল আমরা পূজো করব। আমায় এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দিয়ে চলেছিলেন অশোক ভটাচার্য স্বয়ং, তিনিই বলতেন যেহেতু আমি বসটনে পূজোর পত্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সেহেতু স্লীভল্যানডে পূজোর ব্যাপারে আমাকেই উদ্যোগী হতে হবে।

এদিকে সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী আমাদের ধর্মীয় কোনও অনুষ্ঠানের অধিকার নেই। তাই সংবিধানটারই পরিবর্তন প্রয়োজন। তা, দেখতে দেখতে সংবিধানের পরিবর্তনও হয়ে গেল।

১৯৭৭এ আমিই সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলাম। আর পরের বছরও তাই, আর সেই পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৭৮এ ক্লীভল্যানডের প্রথম দুর্গাপূজানুষ্ঠানে বর্তমান ICC ভবনে সমবেত হলেন বাঙালীরা।

প্রথম বছর ঠাকুর আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে, এ ব্যাপারে কলকাতার অমিয় সরকারের -- যিনি এখানকার বাঙালীদের অনেকেরই পরিচিত -- অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। ছোট ছোট প্রতিমা, তার মধ্যে দুর্গার প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যাবে ক্লীভল্যানড প্রবাসী বাঙালীদের ১৯৯৬এ প্রস্তুত নাম ঠিকানার বইটির প্রচ্ছদপটে।

সেই প্রথম পূজোয় পৌরহিত্য করেছিলেন মন্মাদেব ঘটক, বর্তমানে যিনি ওয়াশিংটনবাসী। তাঁর সহায়তা করেছিলেন সন্তোষদা, প্রয়াত ডক্টর সন্তোষ গোস্বামী। ব্রজেশদা, ডক্টর ব্রজেশ পাকড়াশী, তখনও আসেননি ক্লীভল্যানডে।

পূজোর যোগাড়যন্ত্রে লেগেছিলেন ক্লীভল্যানড প্রবাসিনী সুস্মিতা আচার্য, তিনি পূজোর বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতেন।

১৯৭৬এ এ শহরে ক'জনই বা বাঙালী ছিলেন? সব মিলিয়ে কুড়ি পঁচিশটি পরিবারই হোক। তা-ও শুধু ক্লীভল্যানড নয়, যতদূর মনে পড়ে অ্যাক্রন ইত্যাদি আশেপাশের শহর মিলিয়ে। কিন্তু পূজায় প্রায় সাড়ে তিনশ লোক হয়েছিল। প্রথম বছর তো বটেই, তার পরের বছরও। ডেট্রয়েট, পিট্‌স্‌বার্গ ইত্যাদি থেকেও বাঙালীরা আসতেন তখন, কারণ তখন সেসব শহরে পূজো হতনা। TVতেও পূজো মণ্ডপ দেখানো হয়েছিল। আনন্দ পেয়েছিলেন সকলে। বাইরের শহর থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সাধুবাদ করেছিলেন।

ঠাকুর বিসর্জনের চল নেই বিদেশে, পূজো হয় ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। শুরু থেকেই এ-ই চল। কাজেই বছর দুই তারপর একই প্রতিমা সাজিয়ে পূজো করেছি আমরা। তারপর বোধহয় নতুন প্রতিমা এনে পূজো হল কয়েক বছর। পূজো হয়ে গেলে প্রতিমা বহুদিন আমার বাড়ীতে থেকেছে।

কিন্তু তারও পর যা হল, তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। প্রতিমা এখানেই গড়া হল, গড়লেন ভারতী (বুলবুল) চৌধুরী ও তাঁর স্বামী অশোক চৌধুরী। বুলবুল শিল্পী, শান্তিনিকেতনে মানুষ। তার হাতে গড়া সে প্রতিমাই আজও পূজা পেয়ে চলেছে ক্লীভল্যানডে। আয়তনে বড় প্রতিমা, প্রথমে বোধহয় বুলবুলেরই বাড়ীতে থাকত, তারপর ব্রজেশদা তাঁর বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

এর মধ্যে মন্মাদেব ক্লীভল্যানড ছেড়ে চলে গেলেন। পুরোহিত কোথায় পাই? সেই সময়ে অমিতাভ, ডক্টর অমিতাভ গুপ্ত, আমায় এসে খবর দিলেন, পিট্‌স্‌বার্গ থেকে নতুন একজন বাঙালী চিকিৎসক এসেছেন, তিনি সে-শহরের পূজোয় পৌরহিত্য করেছেন। তাঁকে অনুরোধ করা যাক। সবে এসে পৌঁছানো সেই নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করলাম। এই বাঙালী ভদ্রলোকই আমাদের ব্রজেশদা।

"বিজয়া সম্মিলনী প্রথম থেকেই হয়ে আসছে, কখনও Cleveland State University-র হলে, কখনও ICC-রই বাড়ীতে। এখনকারই মতো আরকি। তবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে গোড়ার দিকে সবই সীমাবদ্ধ ছিল গানে। তারই মধ্যে অবশ্য বৃহত্তর আয়তনে আমাদের নিজেদের শিল্পীদের দিয়ে তো বটেই, কলকাতার শিল্পীদেরও আমন্ত্রন করে নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এখানে গান গেয়ে গিয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও পরে তাঁর পুত্র উৎপলেন্দু, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, সন্ধ্যামিত্রা গুপ্ত । নবীনতর গায়কদের মধ্যে পেয়েছি স্বপন গুপ্ত ও অলক রাচৌধুরীকে। এ শহরের বঙ্গসমাজের কাছে সঙ্গীত পরিবেশন করে গিয়েছেন আলী আকবর। গল্পের আসরে আমরা পেয়েছি

বসন্ত চৌধুরীকে। তাছাড়া নাচ পরিবেশন করেছেন অমিতা দত্ত। আরও অনেকে, যাঁদের সকলেরই কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের স্লীভল্যানডের বাঙালীরা আজও একটা ট্র্যাডিশান রক্ষা করে চলেছি, সেটা হল একটি মাত্র সমিতিতে সকলে সংঘত, সংঘবদ্ধ থাকার ট্র্যাডিশান। অন্যান্য শহরে একটি সমিতি ভেঙে দুটি হয়েছে, কোথাও আরও বেশী। কিন্তু আমরা আজও সকলে আমাদের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থাটিকেই আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছি। আশা করব এ ট্র্যাডিশান থেকে আমরা বিচ্যুত হবনা।

(অনুলিখনঃ কল্যাণ দাশগুপ্ত)

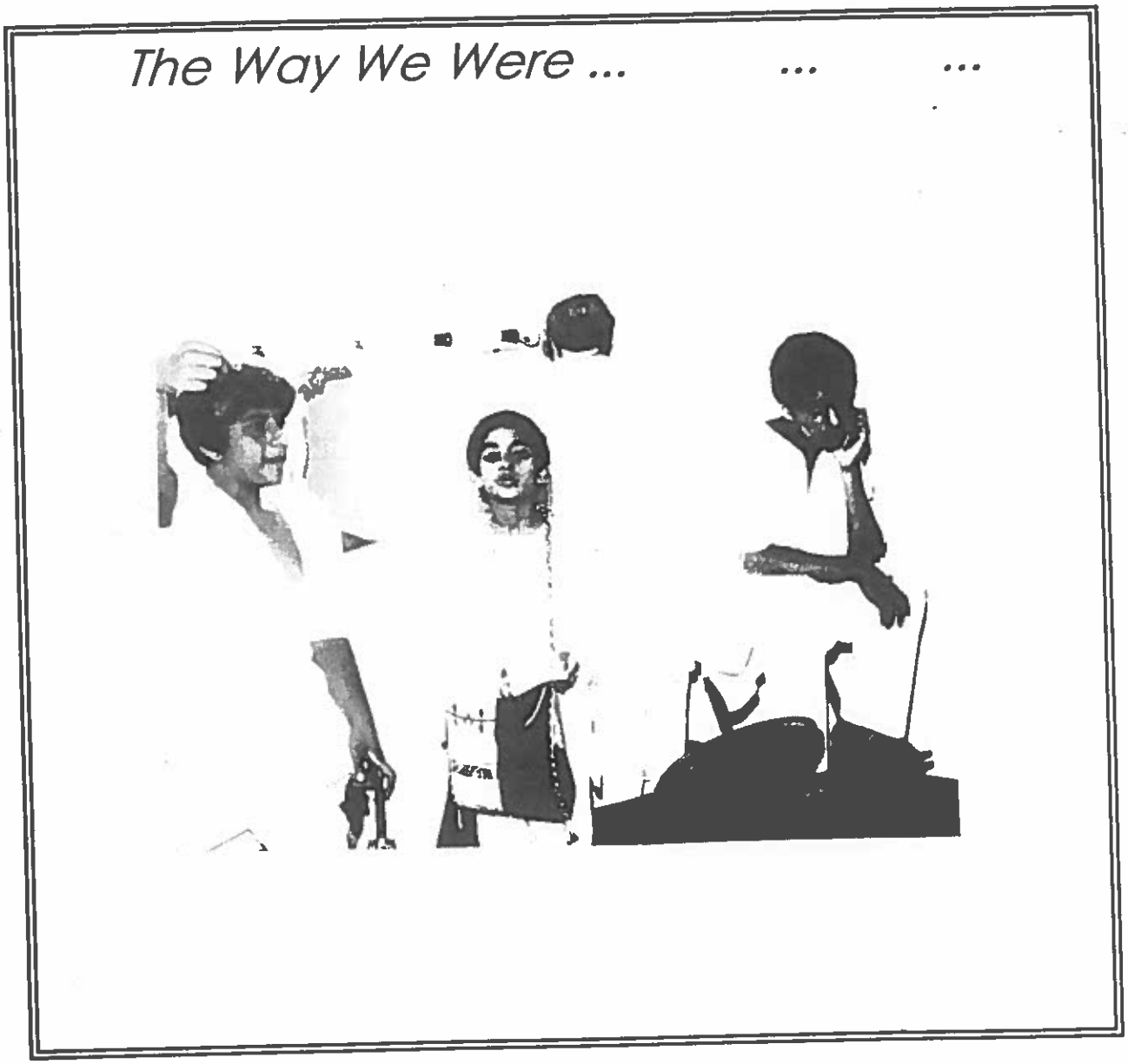

পুরানো সেই দিনের কথা ...

Presidents
Bengali Cultural Society of Cleveland
1971-1997

1971	Ranajit Datta
1972	Ranajit Datta
1973	Ashok Bhattacharya
1974	Gopal Das
1975	Ranajit Datta
1976	Ashok Bhattacharya
1977	Sunil Dutta
1978	Sunil Dutta
1979	Shamin Ghoshtagore
1980	Shamin Ghoshtagore
1981	Amitava Guha
1982	Amitava Guha
1983	Asok Chaudhuri
1984	Subha Sen Pakrashi
1985	Bidhu Mohanty
1986	Gopal Saha
1987	Ashok Bhattacharya
1988	Anjali Bhattacharya
1989	Jiten Dey
1990	Asim Datta
1991	Bidhu Mohanty
1992	Sunil Dutta
1993	Bishnu De
1994	Ratan Maitra
1995	Paritosh Chatterjee and Anup Roy
1996	Sunil Dutta
1997	Subha Sen Pakrashi